বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় উৎপল দত্তের অবদান।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি যখন তাঁর নাট্যজীবনের শেষবেলায়, নবনাট্যের নতুন ভাবনা নিয়ে শম্ভু মিত্র যখন বাংলা নাটকে তাঁর চিরস্থায়ী আসন মুদ্রিত করে ফেলেছেন তখন গণনাট্যের বিপ্লবী ভাবনা নিয়ে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের জগতে প্রতিস্পর্ধী ভঙ্গিতে উপস্থিত হলেন উৎপল দত্ত। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন নাটকের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের বদল ঘটাতে। ফলে তাঁর নাটকে বাস্তবতা এসেছে তীক্ষ্ণ ও অনাবৃতরূপে। জগৎ ও জীবনের কোমল, সুন্দর, মোহময় রূপের প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। ছিল না বলেই তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে রুক্ষতা ও রূঢ়তা লক্ষ করা যায়। আর সে কারণে তাঁর নাটকের সংলাপও তীক্ষ্ণ এবং পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কও অঙ্গাঙ্গী।

নাট্যকার রূপে আবির্ভাবের পূর্বে তিনি অভিনয়জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৪৭-এ জিওফ্রে কেণ্ডালের ' শেপীয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশন্যাল থিয়েটার কোম্পানী'তে যোগ।দেন। তিনি শুধু শেক্‌পিয়ারের নাটক নয়, বার্নার্ড শ, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি নাট্যকারের নাটকেও অভিনয় করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কালে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক—যার মধ্যে ছিল দেশবিভাগ, তেভাগা আন্দোলন,সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি। এই পরিস্থিতিতে নতুন সমাজ গড়ার পরিকল্পনায় উৎপল দত্ত মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক-নাট্যসংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে নাট্যকার,অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এ সময়েই নাট্যপ্রযোজনায় মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে একাত্ম হন।

উৎপল দত্তের নাট্যরচনার সূত্রপাত এই অনুবাদমূলক নাটকের মাধ্যমে। তিনি অনুবাদ করেছেন শেপিয়রের 'ম্যাকবেথ', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'মিডসামার নাইটস ড্রিম', 'জুলিয়াস সিজার,' 'টুয়েলফথ নাইট'; হেনরিক ইবসেনের 'ডলস হাউস' প্রভৃতি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উৎপল দত্ত একনাগাড়ে তাঁর লিটল থিয়েটারের গ্রুপের জন্য এই নাটকগুলি অনুবাদ করেন। উৎপল দত্তের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ছায়ানট' ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চিত্রতারকাদের উত্থান ও পতনের চমকপ্রদ কাহিনি অবলম্বনে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। ছায়াচিত্রলোকের যে সব কুশীলব ছায়ালোকে অভিনয় করে সহস্র সহস্র দর্শকের চিত্তবিনোদন করে চলেছে তাদের ব্যক্তিজীবনের দিকগুলিকে নাট্যকার এই নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

তাঁর পরবর্তী নাটক 'অঙ্গার' মিনার্ভায় ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটক অভিনয়ে দর্শক সমাজে ও নাট্যজগতে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। বিহারের ধানবাদ অঞ্চলের জামাডোবায় চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নাটক রচিত হয়। খনিশ্রমিকদের শোষণ, বঞ্চনা ও লড়াই-এর কথা নিয়ে রচিত এই নাটকের অভিনয় কৌশল ছিল অনবদ্য। নাট্যকার খনিশ্রমিকদের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে সহজ স্বাভাবিক আনন্দময় জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন এভাবে—

"শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একখানা বাড়ি—মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল,—পাকা নয়, তুলসী গাছ থাকবে, তুমি প্রদীপ দেবে, সুমি শাঁখ বাজাবে।"

নাট্যকারের 'পরিচ্ছন্ন চেতনা, মর্মলব্ধ জীবনবোধ 'মানুষের অধিকারে' সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। এই নাটকে দেখানো হয়েছে একটি বিচারের দৃশ্য। যেখানে নিগ্রো মানুষদের উপর শ্বেতাঙ্গ মানুষের অত্যাচারের প্রতিবাদে গঠিত হয়েছে আদালত। জুরিদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে একটি দমবন্ধ করা পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে এই নাটকে। 'দিনবদলের পালা' নাটকটি ১৯৬৭ সালের পশ্চিমের একটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কাহিনি নিয়ে রচিত। কংগ্রেসী

অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল মেহনতী মানুষ—যে তালিকায় আছে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সমাজ। পথনাটক ও মঞ্চনাটকের আদলে নাটকটি রচিত।
১৯৬৭ সালে রচিত 'তীর' নাটকটির মূলে রয়েছে নকশালবাড়ি আন্দোলন। এই আন্দোলন কৃষি বিপ্লবের ডাক দেয়। কৃষক দরদী নেতা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়ীর কৃষকরা লড়াই শুরু করে। তখন পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার যার শরিক ছিল মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। উৎপল দত্ত লক্ষ করেছিলেন চারু মজুমদারের রাজনীতি বেশি গ্রহণযোগ্য। 'লেনিনের ডাক' (১৯৬৯) নাটকটি আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। তখন মার্কসবাদ নিয়ে দেশে ও বিদেশে নানা মতভেদ ও বিভ্রান্তি চলছে। এরকম সময়ে নাট্যকার মার্কসবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার জন্য বেছে নেন লেনিনকে।

উৎপল দত্ত যেসব নাটক লিখেছিলেন তাতে রয়েছে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ। এইসব নাটকগুলি হল— 'বর্গী এলো দেশে'(১৯৭০), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১), 'সূর্যশিকার' (১৯৭১), 'ব্যারিকেড' (১৯৭২), 'টোটা' (১৯৭৩), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (১৯৭৪), 'লেনিন কোথায়,' (১৯৭৬), 'এবার রাজার পালা' (১৯৭৭), 'তিতুমীর' (১৯৭৮), 'দাঁড়াও পথিকবর' (১৯৮০), 'অগ্নিশয্যা' (১৯৮৮), 'নীল সাদা লাল' (১৯৮৯), 'একলা চলো রে' (১৯৮৯), 'লালদুর্গ' (১৯৯০), 'জনতার আফিম' (১৯৯১), 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' (১৯৯২), 'ফুলবাবু' (১৯৯৩)।

'টিনের তলোয়ার' নাটকটি প্রথম রবীন্দ্রসদনে প্রযোজিত হয় ১৯৭১-এর ১২ই আগস্ট। এটি নাট্যকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক স্মরণ মুহূর্তে উৎপল দত্ত 'টিনের তলোয়ার' রচনা করেন। এই নাটকে এক আপোসমুখী অভিনেতার কথা চিত্রিত হয়েছে যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ইংরেজ এবং তার এদেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে। 'টিনের তলোয়ার' রচনার পটভূমিতে রয়েছে এক উগ্র জাতীয় চেতনার ইতিহাস। তলোয়ার এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তিনি এই তলোয়ারকে নিছক তলোয়ার হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে এই তলোয়ার জাতীয়তাবোধের প্রতীক। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায় টিনের তলোয়ার প্রকৃতই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীকী অস্ত্র।

উৎপল দত্তের নাট্যচিন্তা একটু ভিন্ন গোত্রের। কেননা নাট্যচর্চাই ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। সেই যে স্কুল ও কলেজের ছাত্রাবস্থায় নাট্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারপর আমৃত্যু তিনি এই চর্চাতেই মেতে থেকেছেন। শেক্‌পিয়রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব ছিল প্রশংসনীয়। নাট্যপ্রযোজনার পেশাদারিত্ব তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিজেই নাট্যাভিনয়ের দল, যাত্রার দল সংগঠিত করে নাট্যাভিনয়কে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন দর্শক ও থিয়েটারের মধ্যে গণসংযোগ গড়ে উঠুক। উৎপল দত্ত মনে করেছিলেন—নাটক সরাসরি মানুষের কথা বলবে, কোথায় মানুষের সমস্যা, তা খোঁজার চেষ্টা হবে নাটকে। এই নাটক দেখতে এসে মানুষ তাদের নিজেদের জীবন ও সেই জীবনের সমস্যা প্রত্যক্ষ করবে এবং তার সমাধানের উপায় খুঁজে নেবে।